মিম নিয়ে কতকথা

দিগন্ত সরকার

মিম পরিভাষা

'মিম'(meme) পরিভাষাটি (term) প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স, তার বিখ্যাত বই দ্য সেলফিশ জিন -এ। 'মিম' হল 'সাংস্কৃতিক তথ্যের একক', যা একজনের মন থেকে অন্যের মনে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে জিন (শারীরবৃত্তীয় তথ্যের একক) ছড়িয়ে পড়ে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে। প্রবাদ-প্রবচন ('পরিশ্রম করলে ফল মেলে'), গুজব, কিছু স্বাস্থ্যবিধি ('খাওয়ার আগে হাত ধোওয়া উচিত'), ছড়া, পরিভাষা - এরা সবই এক এক ধরনের মিম - যারা আমাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। যে ব্যক্তি মিমটি বহন করে তাদের মিমটির 'হোস্ট' বা বাহক বলা যায়।

'মেমেপ্লেক্স' হল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একদল 'মিম', যারা একসাথে বাহকের মনে অবস্থান করে। এক একটি ধর্ম, এক এক দেশীয় সংস্কৃতি বা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ - এরা সবই মেমেপ্লেক্সের উদাহরণ।

জেনেটিক্সের সমচ্চারিত শব্দ মেমেটিক্স হল মিম-বিবর্তন নিয়ে গবেষণার শাখা - যা তথ্য কিভাবে ছড়ায় তা নিয়ে পর্যালোচনা করে। বর্তমান ধারণা অনুসারে, মিম ছড়ানোর সময়ে এর অনুলিপি-করণ (replication) ছাড়া এদের পুনর্গঠনও হতে পারে - ঠিক যেভাবে গুজব ছড়ানোর সময়ে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে কিছু মিম এর পুনর্গঠনের (recombination) ফলে।

মিম যেভাবে ছড়ায়

যে মিম যত বেশী হারে ছড়িয়ে পড়তে পারবে, সেই মিম তত বেশি করে সংস্কৃতিতে জায়গা করে নিতে পারবে। এটা নির্ভর করে মিম-এর স্থায়ীত্ব আর কত নিখুঁত ভাবে মিমটির অনুলিপি হচ্ছে - তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ, ভগবানে বিশ্বাস করার মিম সেই আদি অনন্ত কাল থেকে অবিকল আকারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে মানব-সংস্কৃতিতে। মিম এর সাফল্য নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর - বাহকের অভিজ্ঞতা, বাহকের ধারণা (speculation), সামাজিক সেন্সরশিপ, উৎস-বিশিষ্টতা ইত্যাদি।

শিশুদের মাধ্যমে মিম

ব্যবহারিক বিবর্তন অনুসারে, যে শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের বাধ্য, তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনে সুবিধা পায়। শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যই মানব-সভ্যতাকে একের পর এক প্রজন্মের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড় করাতে পেরেছে। 'ছাদের ধারে যেও না', 'গভীর জলে যাবে না' বা 'একা একা বনে যাবে না' - বাবা-মায়ের এইসব নির্দেশ মেনে চলা বাধ্য শিশুরা বেশি হারে নির্বাচিত হয়েছে আর সমাজে বাধ্য শিশুর হার বেড়ে চলেছে, আর তারাও তাদের মিম গুলি পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে।

ধর্ম একটি মেমেপ্লেক্স

ধর্ম আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব - এই দুই মিম-গোষ্ঠীরই মানব-সভ্যতায় অনন্য আবেদন আছে। এই মিম গুলি মানুষকে প্রকৃতি সংক্রান্ত জটিল সমস্যার কিছু আপাত সহজ সমাধান দেয়। তার ওপর, এই মানবজীবনে অবিচার হলেও পরবর্তী জীবনে সুবিচার পাবে আর সঠিক জীবনযাপনের পুরস্কার হিসাবে স্বর্গলাভ করবে - এই প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্য গড ডিলিউশন বইএর ১৯৯ পৃষ্ঠায় ডকিন্স ধর্মের আবেদনময় মিমগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন।

ধর্মবিশ্বাসীরা সর্বদা নিজেদের ধর্মীয় জীবনের সুবিধাগুলিই প্রচার করেন। প্রার্থনা করা উপকারে

আসে বা ধর্মবিশ্বাস মানুষের একটা গুণ - এগুলো মূলত ধর্মবিশ্বাসীদের প্রচার। প্রকৃতি বা জীবন-মৃত্যুর রহস্যের সহজ ব্যাখ্যাও ধর্মীয় মিম থেকে পাওয়া যায়। ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মপ্রচারকদের সামাজিক সম্মান তাদের প্রচারিত মিমগুলিকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। নাস্তিক, অধার্মিক, বিপথগামী বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক বয়কট বা শাস্তি দেওয়ার নিয়মও ধর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করে। এই বিশেষ মিমগুলি অন্য মিম-এর প্রভাব থেকে ধর্মের নিজস্ব মেমেপ্লেক্সকে রক্ষা করে।
মিম বিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। একেকটি সম্প্রদায়ের সমাজে ধর্মের একেক রকম ব্যাখ্যা (মিম) পাওয়া যায়, যেগুলি মূল ব্যাখ্যার থেকে পূনর্গঠনের মাধ্যমে উদ্ভূত।

বিজ্ঞান একটি মেমেপ্লেক্স
বিজ্ঞান একটি মেমেপ্লেক্স যার মূল ভিত্তি হল পরীক্ষা এবং প্রমাণ। কোনো তত্ত্ব (মিম) বিজ্ঞানের মেমেপ্লেক্সে জায়গা পাওয়ার জন্য তার পরীক্ষাগত সত্যতা যাচাই করে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানের মিম গুলিরও কিছু অবদান আছে মানব-সভ্যতায় - যে অবদান এই মিমগুলির অস্তিত্ত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য এবিষয়ে উল্লেখ্য - বিজ্ঞানের প্রমাণসাপেক্ষতা আর তত্ত্বীয়করণের ক্ষমতা। মহাকর্ষ সূত্র গুলি আমাদের অনাগত ভবিষ্যতে পৃথিবীর কক্ষপথের আকার-অবস্থান নির্ণয় করতে বা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ভবিষ্যতবাণী করতে সাহায্য করে। এই তত্ত্বীয়করনের সাহায্যে ভবিষ্যতবাণী করার ক্ষমতাই বিজ্ঞান নামক মেমেপ্লেক্সকে মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান
আমাদের আজকের সমাজে যে বিজ্ঞান বনাম ধর্মের প্রতিযোগিতা, তা আসলে এই দুই মেমেপ্লেক্সের লড়াই। বিজ্ঞানের প্রমাণভিত্তিক মিম গুলির শক্তি আর দুর্বলতার কারণ একই - পরিবর্তনশীলতা। নতুন প্রমাণ এলে নতুন তত্ত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয় - এটা যেমন বিজ্ঞানের ভবিষ্যতদর্শনের ক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি মানুষের মনে মিমগুলির স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। নতুন তত্ত্ব(মিম) নতুনভাবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে পুরোনো তত্ত্বকে সরিয়ে, যা সময়সাপেক্ষ। প্রমাণ-নির্ভরতার কারণে বিজ্ঞান কোনোকিছুকে সম্পূর্ণ অপ্রমাণ করতে পারেনা, যার সুযোগে অন্য মিম এর প্রভাব থেকে বিজ্ঞানের মেমেপ্লেক্স সুরক্ষিত থাকে না - যে সুরক্ষাকবচ ধর্ম পায়। মিম বিবর্তনের প্রমাণস্বরূপ বর্তমান সমাজে অপবিজ্ঞান (pseudo science) উপস্থিত, যার উৎস আসলে বিজ্ঞান আর ধর্মের কিছু মিম এর 'ক্রস ওভার'। অপবিজ্ঞান ধর্মীয় অনুশাসনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয় - তাই ধর্মশাসিত সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক সমাজে উত্তরণের পথে এই মিম গুলির অস্তিত্ত্ব থাকতে বাধ্য। ধর্ম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রসারে ধর্মীয় মিম গুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারলে বিজ্ঞান প্রসারের সময়ে তাদের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সবশেষে
রিচার্ড ডকিন্স তার দ্য সেলফিশ জিন বইতে মিম সম্পর্কে লিখেছেন :
'আমরা জিন-মেশিন হিসাবে সৃষ্ট আর আমাদের পরিবেশ আমাদের মিম-মেশিন হিসাবে তৈরী করে দেয়, তবুও আমরাই পারি আমাদের সৃষ্টিকর্তার (জিন) বিরোধিতা করতে - আমাদের স্বার্থপর জিন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে।'
মিম মানুষের বিবর্তনের সেই মিসিং লিঙ্ক যা মানুষের সংস্কৃতির বিকাশের ব্যাখ্যা দেয়। মিম-বিবর্তন ব্যাখ্যা দেয় কেন মানুষ ধর্মযুদ্ধ করে, কেন ধর্মযাজকেরা সারাজীবন অবিবাহিত থাকে - যা সাধারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। তার থেকেও বড় কথা, মিম এর বিবর্তন মানুষকে জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তনের ধারা থেকে মুক্ত করে। মানুষের বিবর্তনে জিন এর চেয়ে মিম এর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। মানুষের ভবিষ্যত-ভাবনা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মানুষের মিম এর পরিবর্তনের আর পুনর্গঠনের মাধ্যমে মানব-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, মিম-বিবর্তন সভ্যতার ক্রমবিকাশের অন্যতম পথপ্রদর্শক।

সূত্র

1) http://www.cscs.umich.edu/%7Ecrshalizi/notebooks/memes.html - Bibiliography
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Meme
3) http://www.jci.org/cgi/reprint/115/11/2961.pdf - Multi-dimensional Evolution